ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 06. No. 01. December 2011

আধুনিক চিত্রশিল্পে আধ্যাত্মবাদী দর্শন: একটি পর্যালোচনা

মো. হারুন আর রশিদ*

সারসংক্ষেপ: আধুনিক আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা বর্ণযুক্ত এবং বর্ণহীন, রেখা নির্ভর ছবির মাঝে আধ্যাত্মবাদ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের চিন্তায় দ্বিতীয়টি দর্শক মানসে ভাব সঞ্চারণের ক্ষেত্রে অনেক বেশী কার্যকরী। অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বস্তু সম্মন্ধীয় জ্ঞান ও শিল্পীর নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রকৃতির সামগ্রীক উপস্থিতি, এই সব কয়টি গুণের সুষম প্রকাশ এই ধরনের 'ছবির' মাঝে বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। ভাব ও তার প্রকাশ এই ক্ষেত্রে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। আধ্যাত্মবাদীদের চিন্তাধারায় চিত্রশিল্প সত্যের স্বরূপ নির্ধারণের পথে একটি নিম্ন পর্যায়ের অধ্যায় মাত্র। বোধগ্রাহ্য অবয়বের মাধ্যমে সত্যের আংশিক প্রকাশ। সভ্যতার অগ্রগতি মানব সমাজকে এমন এক স্তরে উপনীত করেছে যেখানে এই ধরনের উপস্থাপনা মানব মনকে তৃপ্তি দানে অক্ষম। অতএব চিত্রশিল্পকে বয়োবৃদ্ধ মানুষের শৈশবের খেলনা অবলীলায় পরিত্যাগ করার মত। এছাড়া শিল্পের সঠিক সংজ্ঞা বা প্রতিভান নির্ভর। শিল্পবস্তুর উপস্থিতি চিন্তার জগতে নয়, বোধের জগতে। চিত্রশিল্প সত্যের সঠিক অনুলিপি নয়, প্রতীক মাত্র। এই সব আধুনিক আধ্যাত্মবাদী তাত্ত্বিকেরা যদিও মেনে নিয়েছেন যে, জীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে চিত্রশিল্পেও পরিবর্তন ঘটে কিন্তু জীবন ও চিত্রকলার মাঝে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তারা স্বীকার করতে নারাজ। এদের মাঝে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীলদের মতো এরা স্বীকার করে যে যদিও এটা মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তথাপি এগুলো চিত্রশিল্পের অবস্থানজনিত সম্পর্ক মাত্র নিয়ামক শক্তি নয়। এরা পার্থিব জীবনের সাথে চিত্রশিল্পীর মানসিকতার সাযুজ্য নির্ণয়নে অনিচ্ছুক। চিত্রশিল্পীকে কল্পজগত বিহারী এক সত্তারূপে তার সফলতা ঐ আবেগের প্রকাশে। এক কথায় আত্ম অতিরঞ্জনের মানসিক আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে যে কল্প জীবন গড়ে ওঠে, চিত্রশিল্প তারই অভিব্যক্তি। এই মতাদর্শের সর্বাধুনিক সংস্করণ হল মানুষ বর্ণালীর জন্য বর্ণকে এবং আকৃতির জন্যই অবয়বকে ভালবাসে। অতএব সে বর্ণ ও আকৃতির মাঝ দিয়েই বস্তুর অন্তর্নিহিত জীবন প্রত্যক্ষ করে।এর ফলে জাগে এক অপূর্ব ছন্দোপলব্ধি। চিত্রশিল্পী তখন বর্ণ অলিম্পনের মধ্য দিয়ে ছবির মাঝে সেই ছন্দের একটি অনুকৃতি সৃষ্টি করে। এই বিচিত্র ভাবানুভূতি একটি সঙ্গীতের মত। 'চিত্রশিল্প সঙ্গীতকে মুক্তি দান করে এবং তার উপর স্বকীয় উপলব্ধির গুরুত্ব আরোপ করে, চিত্রশিল্পী আমাদের মনোযোগও আকর্ষণ করে'।[২] আধুনিক চিত্রশিল্পীর চিন্তার অবয়ব বা ফর্মই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা। নতুন অবয়বময় এক অভিনব কল্পজগৎ সৃষ্টির তার একমাত্র প্রেরণা। এই রূপের রূপান্তরণ ঘটছে। জীবন ও বাস্তব অবস্থার সম্পর্ক নিহিত এক কল্পজগৎ। প্রতিবেদনশীল ক্রিয়া পদ্ধতি বাস্তব জীবনে নৈতিক দায়িত্ব আরোপ করে। চিত্রকলায় নৈতিক দায়িত্ব অনুপস্থিত। চিত্রশিল্প যুগমানসের এবং তৎকালীন জীবনযাত্রার অনুলিপি। তাই যুগ থেকে যুগান্তরে ইতিহাসের যাত্রাপথের সাথে তাল রেখে চিত্রশিল্পের বিভিন্ন অধ্যায় সূচীত হয়েছে। কিন্তু সমকালে ও সমকালের কাজে তার প্রধান মূল্য হল হাজার বছর ধরে মানুষের জীবন যাত্রার পরিচয়। দাসতন্ত্রের যুগে দেখা যায় শিল্পী এক নতুন জীবনের তথা পুরাতন জীবন যাত্রার পরিবর্তন সমন্ধে মৌলিক আবিষ্কার গুলোর ছাপ, উপাসনালয়গুলোর দেওয়াল চিত্রে বা পিরামিডের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন ভাস্কর্যে এবং চিত্রশিল্পে রেখে গেছেন। বাইজেন্টাইন শিল্পের ডেকোরেটিভ পদ্ধতি বা মধ্যযুগীয় শিল্পাবলী, সাধারণ মানুষের বাস্তব প্রয়োজনে না লাগলেও তাদের জীবন যাত্রার সাথে শাসক শ্রেণীর বিলাস জীবনের যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য তারই প্রতিচ্ছবি বহন করছে।

* প্রভাষক, রাজশাহী চারুকলা মহাবিদ্যালয়।

ভূমিকা

আবহমানকাল ধরেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের চিন্তা ধারায় প্রাধান্য পেয়েছে আধ্যাত্মবাদ। যা পরবর্তীকালে শুধু দার্শনিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছড়িয়েছে চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে। চিত্রশিল্প মানব সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল কিন্তু ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এটির আলোচনা না করলে আধুনিক চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভবপর নয়। সংস্কৃতির চলমান অভিযাত্রার বিভিন্ন ক্রান্তিকালের সংঘাতগুলো লক্ষ্য করার প্রয়োজন আছে। গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছে সংস্কৃতির জয়যাত্রা। মানবিক শক্তির প্রাথমিক উৎস প্রকৃতি। আর এই শক্তিকেই সে প্রয়োগ করেছে প্রকৃতিকে জয় করার জন্য। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। অতএব প্রকৃতির সাথে মানুষের শ্রমের বন্ধনের মাঝেই নিহিত রয়েছে মানব সভ্যতা ও তার সংস্কৃতির মূলসূত্র। যদিও সাংস্কৃতিক চেতনার অনগ্রসরতার কারণে চিত্রশিল্প সম্পর্কে আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অস্বচ্ছ। চিত্রশিল্প যেন এক অলৌকিক ব্যাপার। সমাজের মূল স্রোতধারার সাথে এর সম্পর্ক যেন অচ্ছেদ্য নয়। যদিও চিত্রশিল্প হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। মানব সভ্যতার ইতিহাসের সাথে চিত্রশিল্পের সম্পর্ক নিবিড়। সভ্যতার ঊষাকালে গুহা মানবদের জীবন সংগ্রামের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে চিত্রশিল্প। প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে চিত্রশিল্প ছিল পারলৌকিক সাফলের মাধ্যম। ভারতীয় ঐতিহ্যে ইহলৌকিক নির্বাণ লাভের প্রয়োজনে ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গ হয়েছে চিত্রশিল্প।

চিত্রশিল্প

চিত্রশিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রে দূরুহ ব্যাপার। কারণ, এর নিত্য পরিবর্তনশীল চরিত্র। আর এই পরিবর্তন আধুনিকতাকে অক্ষুণ্ন রেখেও অনেক ক্ষেত্রে অদ্ভুতভাবে বিপরীতমুখী। আবার পাবলো রুয়িথ পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩) আত্ম আলেখ্যে উল্লেখ করেছেন, আধুনিক চিত্রশিল্পের প্রতিটি আঁচড় হচ্ছে ঘড়ির কাঁটার মতো একটি সূক্ষ্ম অথচ নির্দিষ্ট নিয়ম তান্ত্রিক পরিবর্তন। পনের হাজার বছর আগে পাহাড়ের গুহায় আঁকা বাইসনের বা ম্যামথের ছবি অথবা শিল্পী পিকাসোর আঁকা যে কোন ছবিকে আধুনিক বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আধুনিক শব্দটি অভিধানে সাম্প্রতিক অথবা সমকালবর্তী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আধুনিক চিত্রশিল্প এই দ্যোতনার বিস্তার এবং সংকোচ উভয়কেই বোঝায়। গুহা মানবের আঁকা চিত্রসমূহ প্রাচীন কালের হলেও আধুনিক চিত্র হিসেবে গণ্য হতে পারে।

আবার অতি সাম্প্রতিক চিত্রও আধুনিক চিত্র বলে গণ্য নাও হতে পারে। বস্তুত ষাট কিংবা সত্তর বছর আগে সেজান (১৮৩৯- ১৯০৬), পল গগাঁ (১৮৪৮-১৯০৩), ভিনসেন্ট ভ্যানগগ (১৮৫৩- ১৮৯০) প্রমুখের চিত্রগুলিকে সমকালবর্তীরা চিত্র বলে বলে গণ্য করতেন না অথবা খোঁজ রাখতেন না। যদিও এরাই হলেন আধুনিক চিত্রলিল্পের পথিকৃৎ। প্রবাদ প্রমাণ একটা সাধারণ তথ্য প্রচলিত আছে,নবীন চিত্রশিল্পকে প্রথম প্রজন্ম পছন্দ করে না,দ্বিতীয় প্রজন্ম পছন্দ করে, তৃতীয় প্রজন্ম ধ্রুপদী চিত্র বলে সম্মান করে। চতুর্থ প্রজন্ম হয় অবজ্ঞা করে নয়তো প্রত্যাখ্যান করে। বস্তুত পছন্দ, অপছন্দ, গ্রহণ, বর্জন এসমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলো আমেরিকার চিত্রশিল্পী হুইসলার (১৮৩৪-১৯০৩) এর চিত্রের মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রথাগত শিক্ষা না নিয়ে তিনি যেভাবে চিত্র আঁকতেন তাতে অনেকেই তাঁর চিত্রগুলিকে অরুচিকর অপমান বলে বিকৃত করতেন। তাই রাসকিন (১৮১৯-১৯০০) হুইসলারের ছবির বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়েন এবং ফল স্বরূপ হুইসলার রাসকিনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। যাতে তিনি ক্ষতি পূরণ হিসেবে মাত্র এক ফার্দিং পেয়েছিলেন। কিন্তু হুইসলারের 'রাত্রি' সিরিজ যা রাসকিনকে ক্রুদ্ধ করেছিল তাতে হুইসলার অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়েছিলেন। তিনি রাত্রিকেই আঁকতে চেয়েছিলেন তার এই সিরিজে। রাত্রির গভীরতা,অভেদ্যতা, নিশ্ছিদ্রতা এ সবগুলোই তিনি নিজের মতো করে রূপ দিতে চেয়েছিলেন।

আধুনিক চিত্রশিল্পের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক বোধ হয় এটিই। একজন আধুনিকশিল্পী পৃথিবীর যে অংশকে তিনি আঁকতে চান সেটুকুই দেখেন। তার চোখে তার দেখার আগে পৃথিবী ছিল না অথবা তিনি আগে কোনদিনও দেখেননি। কোন রকম পূর্ব ধারণা না নিয়েই তিনি বস্তুটিকে ভাবের দ্বারা নির্মাণ করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক চিত্রশিল্পকে প্রথাগত চিত্রশিল্প থেকে পৃথক করেছে। বহু সমকালীন শিল্পীও জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে পুরোণো ফর্ম, স্টাইল অথবা প্যার্টানকে অনুসরণ করে চলেছেন যেখানে কোন রকম নিজস্বতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

অপরপক্ষে একজন আধুনিক শিল্পী একটা পুরনো শৈলী বা ঘরনাকে বেছে নিতে পারেন কিন্তু তিনি স্বকীয়তার দ্বারা দেশ কালের উপযোগী করে সেই স্টাইল অথবা প্যার্টান এর পুনঃনির্মাণ। যেমন–মাতিশ (১৮৬৯-১৯৫৪) পারশিয়ান শিল্পের ক্ষেত্রে করেছেন। পিকসোর অতিপরিচিত ছবি 'ওমেন' ধ্রুপদী গ্রীক ঘরানার আদলে তৈরি যদিও কেউই এই ছবিটাকে গ্রীসের প্রাথমিক শিল্প বলে ভুল করবেন না । কারণ এর প্রত্যেকটি রেখায় এবং ব্রাশের টানে শিল্পী পিকাসো তার স্বকীয়তার ছাপ রেখে গেছেন। সাধারণভাবে আধুনিক শিল্পী যেমন ভাবের জগত বা মনোজগত দেখতে পারেন তেমনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বাহ্য জগৎকেও এমনভাবে দেখতে পান যেন তিনিই প্রথম লোক যিনি এটিকে দেখছেন না, একটি শিল্প মাধ্যমের দ্বারা সেটাকে দেখাচ্ছেনও বটে। তাই তিনি যখন পাখির ছবি আঁকতে বসেন তখন তার কাছে পাখি শুধু ডানাওয়ালা পাখাওয়ালা প্রাণী নয় বরং তা হয়ে ওঠে স্বাধীনতা অথবা যন্ত্রণার একটি দৃশ্য অভিব্যক্তি। প্রসঙ্গত রুমানিয়ান ভাস্কর ব্রাংকুসির (১৮৭৬-১৯৫৭) 'বার্ড এবং স্পেস' উল্লেখ করা যেতে পারে। তাই একটি ছোট শিশু যখন এক টুকরো কাগজে আঁকি বুকি কেটে বলে এটা চাঁদ, সূর্য অথবা পাখি তখন স্পষ্টতই বোঝা যায় যে এই প্রাণীগুলো তার মনের মধ্যে এই রকম একটা ছাপ কখনো ফেলে ছিলো, যে ছাপ বহির্জগতের সংস্পর্শে এখনো ঐতিহ্যানুযায়ী ছবির ধারণাা থেকে মুক্ত। অবশ্য আধুনিক

শিল্পীর এই মুক্তি শিশু কিংবা বনমানুষের মতো প্রবৃত্তিগত নয়। বরং নিজেকে মুক্তি দেওয়ার একটি সচেতন প্রচেষ্টা যাতে সে সদ্য খোলা চোখ দিয়ে বহির্জগৎ বা অন্তজগতে দেখতে পারে। এর মানে এই নয় যে, প্রত্যেক আধুনিক শিল্পী কোন না কোন ভাবে ছবি আঁকবেন। কিন্তু ছবি হবে রিয়ালিস্টিক কখনই বস্তুর অনুকরণ নয়। আধুনিক চিত্রশিল্পের সজীবতা এবং স্বকীয়তা দুটিই পুরো মাত্রায় বর্তমান।

আধুনিক চিত্রশিল্পের জনক বলে যাকে অভিহিত করা হয় সেই পল সেজান দেখতেন কতগুলো কিউব, সিলিন্ডার, স্ফেয়ার হিসেবে এবং তিনি সেই ভাবেই ছবি এঁকেছিলেন। যদিও তার নিসর্গ দৃশ্য কম্পোজিশান এবং মানব অবয়ব কখনই অদ্ভুত বলে মনে হয় না। তাঁর সজীব, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং তদনুসারে অঙ্কন এমন একটি অন্তর্লীন গঠন যুক্ত হয়েছিল যে সহজেই তার ক্যানভাসের ত্রিমাত্রিক ঘনত্ব ফুটে উঠতো।

আধুনিক চিত্রশিল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এর অনন্ত বৈচিত্র। আধুনিক জীবনের যাবতীয় জটিলতা সমেত যথাযথ প্রতিফলন এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর অসীম বৈচিত্রের মধ্যে প্রত্যেকের কিছু না কিছু উপভোগ্য অংশ আছে। একা পাবলো পিকাসোর ছবিই আধুনিক চিত্রশিল্পের প্রায় প্রত্যেকটি ধারা স্পর্শ করে গেছে এবং কোন কোন ধারার তিনিই প্রবর্তক অথবা পুনঃনির্মাতা তার অনন্য সাধারণ প্রতিভার দ্বারা। তাই আধুনিক চিত্রশিল্প উপভোগের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো সেগুলো বারে বারে দেখা। মনশ্চক্ষু যখন উন্মুক্ত হয় তখনই মানুষের বহিশ্চক্ষু বেশি করে দেখতে পারে এবং দৃষ্টি যখন প্রসারিত হয় তখনই সম্ভব হয় রসবোধ বা আনন্দানুভূতি।

চিত্রশিল্প ও আধ্যাত্মবাদী দর্শন

আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন, প্রকৃতি চিত্রশিল্পীকে আকৃষ্ট করে,এই জন্য যে,'প্রকৃতির বুকে সমস্ত বস্তুই খুত ও অসঙ্গতিপূর্ণ'। একজন চিত্রশিল্পী এই অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থা গুলোতে সঙ্গতি সাধন করে, প্রকৃতির নিজস্ব মাধ্যমেই তাকে শুধরে দেন। প্রকৃতির সঠিক অবস্থা সম্মন্ধে এই ধারণাকেই শিল্পী আদর্শ সৌন্দর্য বলে অভিহিত করেন এবং এই ধারণাই শিল্পীর কর্মপদ্ধতির মূল উৎস স্যার জসোয়া রেনল্ডসের (১৭২৩-১৭৭২) থার্ড ডিসকোর্সেস - ১৭৭০– ১৭৭৭, অ্যারিস্টটল বর্ণিত সূত্রনির্ভর এই নন্দন তত্ত্বটির সম্পূর্ণ বিরোধী একটি মতের প্রবর্তক হলেন, ইতালিয়ান দার্শনিক জিয়মে বাতিস্তা ডিকো। তাঁর মতে সমাজ একটি জৈবিক পদ্ধতির অগ্রগমনমাত্র। সমস্ত আধুনিক চিত্রশিল্পেরধারা এই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ। চিত্রশিল্প আদর্শ মানব ইতিহাসের একটি অধ্যায়। যুক্তির অতীত এক বোধ প্রকাশের মাধ্যম।

আধুনিক আধ্যাত্মবাদী দর্শনের জনক হেগেল, বর্ণযুক্ত এবং বর্ণহীন, শুধুমাত্র রেখানির্ভর ছবির মাঝে পার্থক্য দেখেছেন। তার চিন্তায় দ্বিতীয়টি দর্শক মানসে ভাব সঞ্চারণের ক্ষেত্রে অনেক বেশী কার্যকরী। অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বস্তু সম্মন্ধীয় জ্ঞান ও শিল্পীর নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রকৃতির সামগ্রীক উপস্থিতি, এই সব কয়টি গুণের সুষম প্রকাশ এই ধরনের 'ছবির' মাঝে বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। ভাব ও তার প্রকাশ এই ক্ষেত্রে অঙ্গীভূত হয়ে যায়।[১] হেগেলের চিন্তাধারায় চিত্রশিল্প সত্যের স্বরূপ নির্ধারণের পথে একটি নিম্ন পর্যায়ের অধ্যায় মাত্র। বোধগ্রাহ্য অবয়বের মাধ্যমে সত্যের আংশিক প্রকাশ। সভ্যতার অগ্রগতি মানব সমাজকে এমন এক স্তরে উপনীত করেছে যেখানে এই ধরনের উপস্থাপনা মানব মনকে তৃপ্তি

দানে অক্ষম। অতএব চিত্রশিল্পকে বয়োবৃদ্ধ মানুষের শৈশবের খেলনা অবলীলায় পরিত্যাগ করার মত দূরে ছুড়ে ফেলতে হবে।

চিত্রশিল্প তথা সমগ্র নন্দনতত্ত্বের আধুনিকতম মতবাদের উৎস হলেন, বেনেদেত্তো ক্রোচে (১৪৪২-১৪৯৭)। তাঁর মতে শিল্পের সঠিক সংজ্ঞা বা প্রতিভান নির্ভর। শিল্পবস্তুর উপস্থিতি চিন্তার জগতে নয়, বোধের জগতে। চিত্রশিল্প সত্যের সঠিক অনুলিপি নয়, প্রতীক মাত্র। এই সব আধুনিক আধ্যাত্মবাদী নন্দন তাত্ত্বিকেরা যদিও মেনে নিয়েছেন যে, জীবনের পরিবর্তনের সাথে সাাথে চিত্রশিল্পেও পরিবর্তন ঘটে কিন্তু জীবন ও চিত্রকলার মাঝে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তারা স্বীকার করতে নারাজ। এদের মাঝে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল প্রখ্যাত চিত্রসমালোচক রজার ফ্রাই (১৮৬৬ – ১৪৩৪) এর মতো আমি স্বীকার করি যে যদিও এটা মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তথাপি এগুলো চিত্রশিল্পের অবস্থান জনিত সম্পর্ক মাত্র নিয়ামক শক্তি নয়। এরা পার্থিব জীবনের সাথে চিত্রশিল্পীর মানসিকতার সাযুজ্য নির্ণয়নে অনিচ্ছুক। চিত্রশিল্পীকে কল্পজগত বিহারী এক সত্তা রুপে তার সফলতা ঐ আবেগের প্রকাশে। এক কথায় আত্ম অতিরঞ্জনের মানসিক আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে যে কল্প জীবন গড়ে ওঠে, চিত্রশিল্প তারই অভিব্যক্তি। এই মতাদর্শের সর্বাধুনিক সংস্করণ হল মানুষ বর্ণালীর জন্য বর্ণকে এবং আকৃতির জন্যই অবয়বকে ভালবাসে। অতএব সে বর্ণ ও আকৃতির মাঝ দিয়েই বস্তুর অন্তর্নিহিত জীবন প্রত্যক্ষ করে।এর ফলে জাগে এক অপূর্ব ছন্দোপলব্ধি। চিত্রশিল্পী তখন বর্ণ অলিম্পনের মধ্য দিয়ে ছবির মাঝে সেই ছন্দের একটি অনুকৃতি সৃষ্টি করে।এই বিচিত্র ভাবানুভুতি একটি সঙ্গীতের মত। 'চিত্রশিল্প সঙ্গীতকে মুক্তি দান করে এবং তার উপর স্বকীয় উপলব্ধির গুরুত্ব আরোপ করে, চিত্রশিল্পী আমাদের মনোযোগও আকর্ষণ করে'।[২] আধুনিক চিত্রশিল্পীর চিন্তার অবয়ব বা ফর্মই একমাত্র যুক্তি গ্রাহ্য সংজ্ঞা । নতুন অবয়বময় এক অভিনব কল্পজগৎ সৃষ্টির তার একমাত্র প্রেরণা। এই রুপের রূপান্তরণ ঘটছে। জীবন ও বাস্তব অবস্থার সম্পর্ক নিহিত এক কল্পজগৎ। প্রতিবেদনশীল ক্রিয়া পদ্ধতি বাস্তব জীবনে নৈতিক দায়িত্ব আরোপ করে। চিত্রকলায় নৈতিক দায়িত্ব অনুপস্থিত। চিত্রশিল্প যুগমানসের এবং তৎকালীন জীবনযাত্রার অনুলিপি। তাই যুগ থেকে যুগান্তরে ইতিহাসের যাত্রাপথের সাথে তাল রেখে চিত্রশিল্পের বিভিন্ন অধ্যায় সূচীত হয়েছে। চৈনিক পন্ডিত ইয়াও হুয়ার কথায়"তুন হুয়াং প্রাচীর চিত্র বৌদ্ধ ধর্মের রূপ নির্ণয়ে অত্যন্ত মূল্যবান শিল্পবস্তু। কিন্তু সমকালে ও সমকালের কাজে তার প্রধান মূল্য হল এক হাজার বছর ধরে মানুষের জীবন যাত্রার পরিচয়।[৩] দাসতন্ত্রের যুগে দেখা যায় শিল্পী এক নতুন জীবনের তথা পুরাতন জীবন যাত্রার পরিবর্তন সমন্ধে মৌলিক আবিষ্কার গুলোর ছাপ, উপাসনালয়গুলোর দেওয়াল চিত্রে বা পিরামিডের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন ভাস্কর্যে এবং চিত্রশিল্পে রেখে গেছেন। বাইজেন্টাইন শিল্পের ডেকোরেটিভ পদ্ধতি বা মধ্যযুগীয় শিল্পাবলী, সাধারণ মানুষের বাস্তব প্রযোজনে না লাগলেও তাদের জীবন যাত্রার সাথে শাসক শ্রেণীর বিলাস জীবনের যে আকাশ পাতাল পার্থক্য তারই প্রতিচ্ছবি বহন করছে।[৪]

অর্থনৈতিক বুনিয়াদের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমগ্র সুবিপুল উপরি- কাঠামোটি কমবেশি দ্রুতগতিতে রূপান্তরিত হয। এই রূপান্তরের পর্যালোচনা কালে দুটি বিষয়ের মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য করতে হবে। উপাদানের অর্থনৈতিক অবস্থা গুলোর বৈষয়িক রূপ সমুহ যার মধ্যে থেকে মানুষ এই সংঘাত সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সংগ্রামের মাধ্যমে সেই সমস্যার সমাধান করে। গ্রীক শিল্পের যুগে যে রহস্যঘন সামঞ্জস্য তা সহসা আসেনি। এই বিশেষ সময়টি

দাসতন্ত্র ও জমিদার তন্ত্রের সন্ধিক্ষণ। পুরাতন উপরিকাঠামো চুরমার হয়ে যাচ্ছে আর তারই প্রতিফলন ঘটছে শিল্পে। চিরায়ত গ্রীকশিল্পের সূত্রপাত হয়েছে কয়েকটি ক্রমানুবর্তী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। জমিদারী আভিজাত্য চূর্ণ হয়েছে, ভৌতিক ও ম্যানিক নির্ভর ক্রিয়াকলাপ ভেসে গেছে। পুরাতন ব্যবস্থার মূলে কুঠারঘাত করতে চেয়েছে শোষিত মানুষ। কিছু সাহসী লোক এগিয়ে এসেছে নেতৃত্ব দিতে।

শিল্পী মানস নিষ্ক্রিয় থাকেনি ,সমাজ ও সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের সঠিক তথ্য নির্ভর যুগান্তকারী শিক্ষা চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের মাঝে তুলে ধরেছে। খৃষ্টপুর্ব প্রথম শতাব্দীর দার্শনিক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক এরই বিবরণ রাখতে গিয়ে বলেছেন:

'সে সময় ধনী ও দরিদ্রের মাঝে সম্পদ ও বিত্ত অধিকারের পার্থক্য চুড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। শোষিত মানুষের মাঝে বেশীর ভাগ সময়েই সর্বাপেক্ষা সাহসী লোকেরা জোট বেধেছে এবং নির্যাতিত অধমর্ণদের মুক্তি, ভূমির পূনর্বন্টন এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার জন্য নেতা নির্বাচনে পরস্পরকে উৎসাহিত করেছে।[৫]

বলা বাহুল্য খৃষ্ট পুর্ব প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিকগণ খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর এথেন্সের বিবরণের মালমশল্লার অধিকাংশ জোগাড় করেছেন চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্য থেকে। ষোড়শ শতব্দীর সামন্তবাদী ইউরোপের উপরিকাঠামোটির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ গীর্জা ও ক্যাথিড্রাল গুলি, স্থানীয় চারু ও কারু শিল্পীদের কর্মসংস্থান করেছে। কিন্তু কয়েক পুরুষের মাঝেই এরা গড়ে তুলেছে এক নতুর ধরনের স্থাপত্যের ঐতিহ্য। উদাহরণস্বরূপ, স্পেনের ক্যামপাসটেলা ক্যাথিড্রেল উল্লেখযোগ্য। এখানে দেখতে পাওয়া যাবে, বাইবেলের গাঁথা নির্ভর মনুষ্যকৃতি গুলির মাঝে সমাজের নীচু তলার কারুজীবী শিল্পীর দল নিজেদের জীবন যন্ত্রণার স্বাক্ষর রেখে গেছে। দেখা যায় সেন্ট পিটার ও সেন্ট পল ধান ঝাড়তে ব্যস্ত। পটভূমির চারপাশে সাধারণ কৃষকের কর্মজীবনের ছাপ। কেউ ধান বপন করছে,কেউ ধান কাটছে, কেউ বা মদ তৈরির কাজে ব্যস্ত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভেনিসের 'সেন্টমার্কের' দিন থেকে বিপ্লবী চিত্রশিল্পী গোইয়া (১৭৪৬-১৮২৮) পর্যন্ত গ্রামীণ কামার, ছুতোর অর্থাৎ শ্রমিক, শিল্পী মানসে একটি গভীর আকর্ষণের সঞ্চার করেছে।

এই সাধারণ মানুষের প্রতিচ্ছবি, উঁচুতলার ভদ্রলোকের চোখে জোকার নয়। এ গুলোতে সাধারণ মানুষের আত্ম সম্মানবোধ জাগ্রত। রাজা রাণীর দল তাই দেবতা হিসেবে চিত্রিত হয়নি। শ্রেণী বিরোধের একটি ধারণা সর্বপ্রথম চিত্রশিল্পের জগতে অত্যন্ত দৃপ্ত পদক্ষেপ প্রবেশ করেছে।গীর্জাগুলিতেই যখন নিজেদের জীবনযাত্রা ও জীবন সম্বন্ধে ধারণার স্বাক্ষর রেখে গেছে।[৬]

রেনেসাঁস যুগেও চিত্রশিল্পের দুটি স্ববিরোধী ধারা বিদ্যমান। একদিক বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য, যৌবনের ঔজ্জ্বল্য, জীবনের প্রতি অসীম মমত্ববোধ আর অন্য দিকে সাধারণ মানুষের ওপর শাসক শ্রেণীর শোষণ, নিষ্ঠুরতা, অধিকার ও অত্যাচারের নির্ভীক প্রতিফলনের সত্যাশ্রয়ী আগ্রহ। তখন সমাজতন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে বুর্জোয়াতন্ত্রের মাঝে। সাধারণ মানুষের মনে জেগেছে আসার দ্যোতনা। কিন্তু এই বুর্জোয়াতন্ত্রের শীর্ষে সমারুঢ় কতিপয় আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্ধ নিষ্টুর শোষক ও আপেক্ষিক প্রগতিশীলতার মাঝে যে দ্বন্দ বিদ্যমান, চিত্রকলায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে। রেনেসাঁস এর শিল্পীদের মাঝে একটি বিশেষ গুণ বিদ্যমান, তাহলো

এদের অনেকেই জীবন ও জাগতিক জ্ঞানের বহুল ব্যাপ্তির মাঝে নিজেদের মানসিকতাকে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন। এই যুগের প্রধান দুটি স্রোতের প্রতিটিই লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (১৪৫২-১১৪৯) আলোচ্য চিত্র সম্ভারে বিদ্যমান। 'মোনলিসা" ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কমনীয় সৌন্দর্যের প্রতীক, সমাজে প্রতিষ্ঠাকামী এক নারীর সার্থক প্রতিচ্ছবি।

অন্যদিকে রয়েছে 'আংঘিয়ারির যুদ্ধ' এই চিত্রে ফুটে উঠেছে যুদ্ধের বিভীষিকা। ঘোড়াগুলো পর্যন্ত যেভাবে পরস্পরকে কামড়াতে উদ্যত তা দর্শনে দর্শক মানসে একটি বোধই জাগ্রত হয়। যুদ্ধ ও যুদ্ধবাজদের সাথে কোন আপোষ নেই, তারা ঘৃণার পাত্র। মানব ইতিহাসে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এটি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বলিষ্ঠ আক্রমণ।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমাজতন্ত্রী দুনিয়া আরো বেশি সংকটগ্রস্ত হয়েছে। ইংল্যান্ডের, রোমের চার্চোর, আওতা থেকে বেরিয়ে আসা, আমেরিকা থেকে সোনা আমদানীর ফলে পুজিবাদী শিল্পব্যবস্থায় দ্রুত উন্নতি, কুটিরশিল্প রক্ষায় সামন্ততন্ত্রের অক্ষমতা গ্রামীণ মানুষের চরম দুর্গতি তারই অবশ্যম্ভাবী ফল। ১৪৭৬ এবং ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিক কৃষক বিদ্রোহ বুর্জোয়াদের অনগ্রসর অংশের সাথে সামন্তবাদী প্রতিষ্ঠান গুলোর মিত্রতা ও তার ফলে সেই সব দেশের তুলনা মূলক বিচারে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা প্রভুতি মেহনতী মানুষের অবর্ননীয় দুঃখের কারণ হয়েছে। চিত্র শিল্পে এই সংকট প্রতিভাত হয়েছে। ফ্রেমিস শিল্পী হিরোনিমাসবচ (১৪৫০-১৫১৬) এর ছবিগুলো তারই সাক্ষর। কৃষক বিদ্রোহের যোদ্ধা শিল্পী গ্রুনে ওয়াল্ড, ম্যাথিস নিথার্ট (১৪৭০ -১৫২৮) এর চিত্রে জ্বালা যন্ত্রনার অবসান ঘটানোর জন্য একটি সংগ্রামী মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। চিত্র সমালোচক ও ঐতিহাসিক ভাসরি (১৫১১-১৫৭৫) তার ' দি লাইফ অফ দ্যা পেইন্টার, স্কাল্পটর এন্ড আর্কিটেক্ট' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন 'ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা চিত্রশিল্পের পক্ষে মৃত্যুর চুম্বনের মতো'মন্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য কারণ বহু চিত্রশিল্পীই স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের লোভে, ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের অর্থাৎ শাসক ও শোষক শ্রেণীর ভাবনাদর্শকে মনে নিয়ে দাস মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাদের চিত্রশিল্প, শিল্প হয়ে ওঠেনি,হয়ে উঠেছে প্রভুর মনোরঞ্জনের উপকরণ। কিন্তু সংস্কৃতিক জয়যাত্রা থেমে থাকেনা। প্রতিটি অধ্যায়েই রয়ে গেছেন পথের দিশারী। যারা সংস্কৃতির অগ্রগমনে মানুষের চিন্তা জগতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। চিত্রশিল্পের দুনিয়াতেও এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই শতাব্দীর সুমহান ডাচ্ শিল্পী রেমব্রেন্ট (১৬০৬ - ১৬৬৯) তার চিত্রাশিল্প সব দিক থেকেই 'বাস্তববাদী সুর' । কিন্তু প্রেক্ষাপট বহু বিস্তীর্ণ। সেখানে সমাজের সকল স্তরের মানুষ ভিড় জমিয়েছে। চিত্রশিল্পীর জীবিকাকে সম্মান ও সৌভাগ্যজনক করে তোলার প্রচেষ্টায় তার অবদান চিরস্মরনীয়। পৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে এই শিল্পী সমাজের ওপর তলার অধিবাসীদের প্রতিকৃতি আঁকার কাজ বর্জন করেন। তার ছবিতে ফুটে উঠেছে সেই সব মানুষ যাদের আছে দুঃখ ও জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা। এর অর্থ এই নয় যে, বিষাদই রেমব্রেন্টের প্রধান সুর। জীবনের সৌকুমার্য, হাসি- কান্না, হর্ষ - বিষাদ সবই তার চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। সেই হৃদয়াবেগ মূলত নিপীড়িত মানুষের, যে মানুষকে, যে সমাজকে তিনি মানবিকতার আসনে বসিয়েছেন, তুলে ধরেছেন তাদের জীবনের সৌন্দর্য, ঘোষনা করেছেন সকল মানুষ সমান। তার এই প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালের চিত্রশিল্পীদের এক বিরাট জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করেছে। কবে এই বঞ্চনার অবসান হবে? এর পর থেকে চিত্রশিল্পে মানুষ, মানুষ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে. অযথা গরিমার অলংকারনের আড়ালে অতি মানুষ বা অমানুষ রূপে নয়।

চিত্রশিল্পের ইতিহাসে গোইয়া (১৭৪৬-১৮২৮)-ই একটি অবিনশ্বর নাম। তিনি বিদ্রোহী শিল্পী এই তার পরিচয়। যদিও তিনি বাহ্যত একজন সভাসদ, তথাপি তিনি তীব্রভাবে আক্রমন চালিয়ে স্প্যানিশ রাজতন্ত্রের গরিমাকে খর্ব করেছেন, দৃশ্যত ক্যাথলিক মতবাদের প্রতি আনুগত্য দেখালেও তিনি গীর্জা গুলো যা জনসাধারণকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার বিরুদ্ধে সুকৌশলে আক্রমন চালিয়েছেন। গোইয়াই প্রথম শিল্পী যিনি সর্ব প্রথম ইচ্ছাকৃত ও ধারাবাহিক ভাবে যুদ্ধবাজদের অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন,(স্যার উইলিয়াম ওরপেন,অন হিম ওন আর্ট)। জুলাই ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পটভূমিতে আঁকা ইউজেন দেলাক্রোয়া (১৭৯৪-১৮৬৩)-এর 'দি ব্যারিগেড' অধুনা 'গাইডিং দি পিপল' শীর্ষক চিত্রটি যুগে যুগে বিপ্লবীদের প্রেরণা যুগিয়েছে। ইংল্যান্ডের ওয়াটসন (১৮১৭−১৯০৪) এবং আলফ্রেড ষ্ট্যাভেন্স (১৮১৭- ১৮৭৫) স্পষ্টভাবে প্রচলিত শোষন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ফ্রাঁন্সের জাঁ ফ্রাঁসোঁয়া মিলিত (১৮১৪-১৮৭৫) চাষীর ঘরের ছেলে, তার অবিস্মরনীয় চিত্র 'দি সোয়ার'শৈল্পিক গুণাবলীর বিচারে এটি একটি মহাকাব্য বিশেষ। একটি নগণ্য ক্ষেতমজুরের কার্যকলাপ ও পরিবেশের মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ সৃজিত হয়েছে যাতে ফুটে উঠেছে, বর্তমানে বুকে নিহিত ভবিষ্যতের বীজ। সমাজের বুকে শোষিত মানুষের একটি চিত্রের মাঝে তার বোধকে রূপায়িত করার আগে প্রতিটি শিল্পীকেই কতিপয় বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যেমন অবলোকন, ধারন, স্মৃতিতে সেই অভিজ্ঞতার সঞ্চারণ অতঃপর অন্য এক বস্তুতে আকৃতির মাধ্যমে তার রূপদান।এই প্রক্রিয়া সমষ্টির মূল উদ্দেশ্য হল-' নিজের মধ্যে এই বোধ জেগে ওঠার পর বিচলন, রেখা, বর্ণ অথবা শব্দের মধ্যে বিধৃত কিছু আকৃতির মাধ্যমে অপরের মনে সেই বোধের সঞ্চালন,যার ফলে দর্শকের মনেও ঐ একই বোধের সাড়া জাগে'।

বাটর্ল্ট ব্রেখটের কথায় শিল্পকর্মের উদ্দেশ্যটি আরও স্পষ্ট হয়েছে। অভিনয় কলা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন 'আমাদের শ্রোতাম―লী শুধু মাত্র কেমন করে প্রমিথিয়াসের বন্ধন মুক্ত ঘটল তাই শুনবে না,তারা তাকে মুক্ত করার যে আনন্দ তা অনুশীলন করবে'। দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি চিত্রাঙ্কন প্রক্রিয়ার মাঝেও বিরাজ মান। চিত্রশিল্পে এই পদ্ধতির অনুধাবন করতে হলে কি ভাবে শিল্পী দর্শক মানসে সমার্থক অনুভূতির দ্যোতনা সঞ্চারিত করেন তার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। যে কোন চিত্রের নকশা বাা ডিজাইনের অন্তর্গত মৌল উপাদান গুলি স্ববিরোধপ্রসূত।

প্রথমত রেখার ছন্দোময়তার মাঝে রূপ বিধৃত হয়। এটি যদিও একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় লিপিবদ্ধ করেন, তথাপি ভঙ্গিমাটির যথার্থ প্রতিচ্ছবি নয়। বস্তুর অবয়বগত ভঙ্গিমার আকৃতি দর্শনে শিল্পী মানসে যে অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে, এটি তারই অনুলিপি এবং এইখানেই সংঘাত।

দ্বিতীয়ত পরিমাণ বা 'ম্যাস' প্রতিটি সামগ্রীরই অন্তর্নিহিত জাড্যর ফলে গতি প্রতিরোধ ক্ষমতা অনুভূত হয়। এরই ফলে বস্তুটি নিজস্ব গতি অপর বস্তুতে সঞ্চারণে সক্ষম, এই ভাব মূর্তির কল্পনামূলক প্রতিক্রিয়া বাস্তব জীবনে 'পরিমাণ' নির্ভর অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

তৃতীয়ত ব্যক্তিগত ব্যবধান। একই পরিমাপে দুইটি চতুঃষ্কোণকে পৃথকভাবে দুই বা তিন ইঞ্চি ঘনক্ষেত্র এবং কয়েকশ ফুট উচুঁ ঘনক্ষেত্র রূপে দেখানো সম্ভব। দর্শক মানসের প্রতিক্রিয়াও এর ফলে আনুপাতিক হারে পরিবর্তিত হতে বাধ্য।

চতুর্থত আলো এবং ছায়া একই বস্তুতে কালো পটভূমিকায় উজ্জল আলোক সম্পাত যুক্ত অবস্থায় অথবা আলোর মধ্যে ছায়াছন্ন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করার ফলে যে ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি ঘটে তা মূলত বিপরীতধর্মী।

পঞ্চমত বর্ণ, বর্ণাবলোকনের ফলে সর্বদাই একটি আবেগজনিত আরোপিত প্রভাব ঘটে। সেই জন্য আমরা বর্ণালীর গুণ বিবরণের সময় উজ্জল, নিস্তেজ, বিষণ্ন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি।

ষষ্ঠত পরিমাণ ও আয়তন এর সংযুক্তির ফল ,চক্ষুর সাথে দৃশ্যমান 'তল'এর আনতির কারণে দৃশ্যমান বস্তুটি দর্শকের দিকে ঝুকে আসতে বা দূরে সরে যেতে চায়। এর ফলে একটি বিশেষ বোধ দর্শক মানসে সঞ্চারিত হয়।

সপ্তমত শিল্পীর মানসিকতা ও ধারণ ক্ষমতা। এটির ওপর সে যে শ্রেণীর অন্তর্গত তার অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান। উপরিবর্নীত সূত্র গুলি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, একটি সার্থক চিত্র,বিভিন্ন পর্যায়ে বহুতর স্ববিরোধের পারস্পরিক সংঘাতের ফলে ধীরে ধীরে পরিমাণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজস্ব সমন্বিত একটি বক্তব্যেও ভাস্কর প্রকাশ। যার অন্তর্নিহিত বিচ্ছিন্ন উপাদান গুলোর স্ব স্ব গুণাবলী, বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও পরিমার্জনের স্বাক্ষর বহন করেই একক অবস্থায় প্রথমে শিল্পী মানসে ও পরে চিত্রটির অবয়বের মাঝে সন্নিবিষ্ট হয় এবং দর্শক মানসে এমন একটি সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে যা চিত্রে সন্নিবেশিত আকৃতি গুলোর পৃথকীকরণের পর, সে গুলো যে ধরনের গুণগত প্রতিক্রিয়া আনয়নে সক্ষম ,তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এই প্রাপ্তির পথে চিত্রশিল্পীর চিত্রাঙ্কনের দক্ষতা অন্যতম মূল উপাদান। এই দক্ষতা শ্রম বিভাগের ফল।

উপসংহার

চিত্রশিল্প সমাজকে প্রাকৃতিক ও জাগতিক বাস্তব অবস্থা ও তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক রূপে সচেতন করে তোলে। চিত্র যেহেতু শিল্পীর সৌন্দর্য বোধ বিশিষ্ট আবেগ বহনে সক্ষম এবং প্রকৃতির মাঝে দৃশ্যমান বস্তুই যেহেতু শিল্পী মানসে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া সৃজনের একমাত্র কারণ নয়,বাস্তব পরিবেশের সামাজিক সংঘাত ও অন্যতম মূল কারণ। অতএব সেটি শুধুমাত্র প্রকৃতির কল্পমূলক প্রতিকৃতি নয়। শিল্পী মানসে তৎকালীন সামগ্রীক প্রতিক্রিয়াা, প্রতিচ্ছবি, জীবনের স্ববিরোধ প্রসূত এক বিশেষ বক্তব্য, যে বক্তব্য দর্শক মানসে এক নবীন বোধের দ্যোতনা সঞ্চারে সক্ষম। অতএব শিল্পীর মানব সমাজের প্রতি বিশেষত সে যে শ্রেণীর মানুষ, সেই শ্রেণীর প্রতি একটা দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব পালন, বিখ্যাত বিপ্লবী ইংরেজ চিত্রশিল্পী জর্জ ফ্রেডারিক ওয়াটস (১৮১৭-১৯০৪) এর কথায় আধিপত্যের ইংগিতকরে। তাঁর 'দি গ্লিনার্স' ছবিটি প্রথম প্রকাশের সময়ই 'সময়ই' প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রচার 'হিসাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা অভিযুক্ত হওয়ার ফলে জনমানসে তুমুল ঝড় তুলেছিল। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছে,শোষণ ব্যবস্থা যক্ষের মতো চেপে বসেছে সাধারণ মানুষের বুকে। শিল্পীর বিশ্ববীক্ষা, সমাজগত না হয়ে, বিমূর্ত ভাবময় জগতে,বিচরণে উন্মুখ হয়েছে; জীবন সংগ্রামে পরান্মুখ শিল্পী পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। চিত্রশিল্পের জগতে বিমূর্ত চিন্তা ধারা নতুন পথ উন্মুক্ত করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু সেই কল্পজগতে সাধারণ মানুষের সম্পর্কহীন 'সমষ্টিসত্তা থেকে বিচ্যুত'।

শিল্পীর দল এক সর্বগ্রাসী শূণ্যতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন। পরিণামে আপন সত্তা থেকে বিচ্যুত শিল্পী অভিব্যক্তির এমন এক স্থানে পৌঁছেছেন ,যেখানে তার নিজস্ব মানব সত্তাও আর স্বীকৃত নয় এবং তার সাথে সাথে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ বস্তুবোধ বিনষ্ট করে দিচ্ছেন। প্রত্যক্ষের বিনাশ অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী সভ্যতার একটি মূখ্য শিল্প বৈশিষ্ট্য। ম্যাজিক ও প্রতিবেশ বিজয়ের প্রক্রিয়া চিত্রশিল্পের উৎপত্তির অন্যতম কারণ, আর তা ঘটেছে দক্ষ, শ্রম বিন্যাসের মাঝ দিয়ে। শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে এসেছে শিল্পী মনের চেতনার পরিস্ফুটন, যা কিছু কদর্য যা কিছু অন্যায় তার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শ্রেণী সংগ্রামের ফলে আজকের দুনিয়ায় সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রধান প্রগতিশীল শক্তিরুপে প্রতিভাত। তাই পাশাপাশি গড়ে উঠেছে 'স্যোশিয়ালিষ্ট আর্ট' যা সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদী ধারনার ওপর নির্ভরশীল। এপথে অতীতে অনেক ভুল ভ্রান্তি ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো ঘটবে। কিন্তু যান্ত্রিক বিকাশের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে যে নতুন চিত্রশিল্পের জগত গড়ে উঠেছে তার একটি অর্থ হলো শিল্প অবিনাশী।

তথ্য সংকেত

১. Hegel. G.W.F, *The Philosophy of Fine Art* (London, Oxford, Vol.3, 1975).
২. Henry Bergson Laughter, *An Essay on the Meaning of Comic*, (New York, 1911).
৩. Eyao Hua, *Tun Treasure House of Ancient Art.*
৪. Marks, *A Contribution to the Critic of Political Economy.*
৫. Plutarck, *The Life of the Noble and Grecians Romans.*
৬. Sidney Fin Felestabarn, *Realism in Art.*
৭. ফয়েজুল আজিম, *চারুকলার ভূমিকা*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২)।
৮. চিন্তমনিকর, *পাবলো পিকাসো (রেখা ও রঙের বিপ্লবে)* (কলিকাতা, নর্বাক, ১৯৮৭)।
৯. আব্দুল হালিম, *মায়া, আজটেক ও ইনকা সভ্যতা* (ঢাকা, বাংলা একাডেমী,১৯৮৫)।
১০. নিখিল বিশ্বাস, *শিল্পের চোখ*, (কলকাতা, মনচাষা, ২০০৪)।
১১. বুলবন ওসমান, *বিশ্বশিল্পের ইতিহাস* (ঢাকা, চারুলিপি, ২০০৯) ৮২, পৃ. ৮২।
১২. শোভন সোম, *চিত্রভাবন* (কোলকাতা, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়প্রকাশনা, ১৯৮৬)।